Issue cover not available

Vol. 13 | No. 1 | 1969

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

এ্যারিস্টটলের কাব্য সমালোচনা

Volume	13
Issue	1
Year	1969
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী
Published online	June 1, 1969
DOI	10.62328/sp.v13i1.2
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v13i1.2
Pages	53-77
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

এ্যারিস্টটলের কাব্যসমালোচনা

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

সেণ্ট থমাস একুইনাস এ্যারিস্টটলকে বলেছেন 'দার্শনিক', দান্তে বলেছেন 'জ্ঞানীদের শিক্ষক'। প্রায় আড়াই হাজার বছর অতিবাহিত হবার পরও চিন্তার ক্রমসম্প্রসারণশীল রাজ্যে এ্যারিস্টটলের মর্য্যাদার আসন বিপর্যস্ত দূরের কথা, বিপদগ্রস্তও হয়নি ঃ জ্ঞানীদের শিক্ষক তিনি এখনো, কিন্তু দার্শনিক না বলে অধুনাতন পরিভাষায় তাঁকে বৈজ্ঞানিক বলাই শ্রেয়। তিনিই সম্ভবতঃ পৃথিবীর প্রথম বৈজ্ঞানিক। সক্রেটিস যদি মানুষকে দর্শন শিখিয়ে থাকেন, এ্যারিস্টটল শিখিয়েছেন বিজ্ঞান। পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণের প্রায় কোন কৌশলই যখন জানা ছিল না, যান্ত্রিক উপকরণাদি যখন অনাবিষ্কৃত সেই কালে অসামান্য কৌতুহল নিয়ে তিনি বস্তুকে বিচার করেছেন বিশ্লিষ্ট করে; মানুষের অন্তর্লোক থেকে সুরু করে তাঁর চোখ গেছে আকাশের নক্ষত্রলোক পর্যন্ত। রাজনীতির বিশ্লেষণ যেমন করেছেন তেমনি অনুসন্ধান করেছেন নীতিশাস্ত্রের ভিত্তি ও প্রকৃতি। জীবদেহের সংগঠন যেমন নিরীক্ষণ করেছেন, তেমনি পর্যালোচনা করেছেন শিল্পতত্ত্বের ও বক্তৃতাবিজ্ঞানের। একদিকে তিনি শিক্ষা দিয়েছেন তার্কিক অবরোহন, অন্যদিকে বৈজ্ঞানিক অধিরোহন। তাঁর চরিত্রে বৈজ্ঞানিক কৌতুহলের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল গ্রন্থপাঠে উৎসাহ ঃ এ্যারিস্টটলই পৃথিবীর প্রথম বৈজ্ঞানিক।

জীবন ও জগতের সকল দিকে দৃষ্টি দেবার এমন প্রচেষ্টা পরবর্তীকালে আরো একবার হয়েছিল। রেনেসান্সের সময়—যে-সময়ে মানুষের সাধনা ছিল সম্পূর্ণ মনুষ্যত্ব অর্জনের। কিন্তু সেই বিশেষ কালেরও কোন একজন সাধকের জীবনে এ্যারিস্টটলের মত সাফল্য আসেনি। এ্যারিস্টটলের যথার্থ উপমা তাই বিশ্বকোষ। কেউ বলেন তিনি চার শ' বই লিখেছেন, কারো ধারণা এক হাজার। প্রকৃত সংখ্যা এখনো নির্ণীত হয়নি; কিছু বইয়ের নাম জানা গেছে, তার চেয়েও অল্প

সংখ্যক বই হাতে এসেছে ভাবীকালের। কিন্তু ঐ অল্পকিছু থেকেই বোঝা যায় কি অসামান্য মানুষ ছিলেন এই বৈজ্ঞানিক। বলা হয়ে থাকে যে, বিগত আড়াই হাজার বছরে মানুষের চিন্তায় যে-অগ্রগতি হয়েছে তা এ্যারিস্টটলের সঙ্গে ঐক্য-মতের ও মতদ্বৈধেরই ইতিহাস। মধ্যযুগে তাঁর মতামতের মূল্য ও মর্যাদা ছিল বাইবেলের সমান; পরবর্তীকালে তিনি কখনো অবশ্যমান্য, কখনো বা সমালোচিত, কিন্তু কোন অবস্থাতেই উপেক্ষিত নন।

চিন্তার প্রকরণ ও প্রবণতার ক্ষেত্রে এ্যারিস্টটলের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার একটি সহজ উপায় প্লেটোর সাথে তাঁর তুলনা করা। রোমক চিন্তাবিদ সিসেরো এ্যারিস্টটলের লেখনরীতিকে সোনালী নির্ঝরের সঙ্গে তুলনাযোগ্য বিবেচনা করতেন। কিন্তু এ্যারিস্টটল প্রথম জীবনে মৃত বন্ধুর উদ্দেশ্যে কবিতা লিখেছিলেন এমন খবর যদি-বা জানা যায় তবু তাঁর যে-সকল রচনা উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে তাদের কোনটির লেখনরীতিতেই স্বর্ণের কোন আভা বা নির্ঝরের কোন কলরোল নেই। সে-লেখার রীতি বরং সতর্ক ও পদচারী, বৈজ্ঞানিক ও যথার্থ: তাম্রাভ হতে পারে, কিন্তু স্বর্ণাভব আদৌ নয়।

এ থেকে অনুমান করা যায় যে, তাঁর যে-সকল রচনা সোনালী নির্ঝরের গৌরবগর্বিত সে-গুলো তাঁর প্রথম জীবনের সৃষ্টি। এবং এও ধরে নিতে পারি যে, ঐ বিশেষ গৌরবের পেছনে তাঁর শিক্ষাগুরু প্লেটোর প্রভাব অবর্তমান নয়। যে-বিশ বছর তিনি প্লেটোর একাডেমিতে ছাত্র ছিলেন তখন গুরুকে শ্রদ্ধা করার সঙ্গে সঙ্গে গুরুর প্রভাবকেও জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে মান্য করে থাকবেন। লেখার ধরনেও হয়ত সেই প্রভাব প্রকাশ পেয়েছিল। প্লেটো জানতেন যে, তাঁর ছাত্রদের মধ্যে এ্যারিস্টটলই ছিলেন সবচেয়ে বেশী মেধাবী ও প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন। এ্যারিস্টটলকে নাকি তিনি বলতেন 'বিজ্ঞতার প্রতিমূর্তি;' এ্যারিস্টটলের বাড়ির নাকি তিনি নাম দিয়েছিলেন 'পাঠকের গৃহ'।

সন্দেহ করা হয় যে, এই দ্বিতীয় উক্তিতে বিদ্রূপ প্রচ্ছন্ন ছিল। হয়ত সেটা অসত্যও নয়; অথবা হতে পারে এই সন্দেহের কারণ এই সত্য যে, পরবর্তী জীবনে এ্যারিস্টটল প্লেটোর মতামতকে অনেক ক্ষেত্রেই উল্লঙ্ঘন করেছেন, কোথাও পাল্টা মতবাদ চালু করেছেন সজ্ঞানে! যেহেতু এ্যারিস্টটলের পরবর্তী জীবনের রচনার সঙ্গেই শুধু আমাদের পরিচয় তা-ই এই দু'জন দার্শনিকের মানস-সংগঠনের

বৈপরীত্যের দিকটাই আমাদের কাছে বেশী স্পষ্ট। কিন্তু কেবল মানস-সংগঠন বলে নয়, বিভিন্নতা ছিল প্রস্তুতিতেও। প্লেটোর আজন্ম লালন এথেনীয় সংস্কৃতির আলো-বাতাসে; এ্যারিস্টটলের বাল্যকাল যাপিত স্টাগাইরাতে। প্লেটো তাঁর প্রথম জীবনে পারদর্শিতা প্রদর্শন করেছেন ক্রীড়াকৌশলে, সামর্থ্যের পরিচয় দিয়েছেন যুদ্ধক্ষেত্রে। সেই সঙ্গে সুস্তপ্ত ছিল এক কবিসত্ত্বা। এই পরিচয়ের যথার্থ প্রকাশ ঘটেছে সংলাপের আকারে যে-সকল কথোপকথন তিনি রচনা করেছিলেন তাদের নাটকীয় রূপকল্প ও উপমাবহুল ভাষায়, তাদের অভ্যন্তরিক সত্যের সঙ্গে রূপকের সংমিশ্রণে, বাস্তবের সঙ্গে সৌন্দর্যের অবিচ্ছেদ্যতায় এবং সর্বোপরি রচনাগুলির উপজীব্য ধারনাসমূহের উদ্ভাবনায় নিয়োজিত কল্পনার ঐশর্যে। অনেকক্ষেত্রে প্লেটোর রচনাপাঠ কাব্যপাঠেরই নামান্তর।

ওদিকে এ্যারিস্টটল দাঁড়িয়ে আছেন বিপরীত কোটিতে। স্বপ্নের সঙ্গে জিজ্ঞাসার যোগাযোগ সংগঠনে যদি গ্রীক-প্রতিভার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত হয়ে থাকে তাহলে বলা যায় প্লেটোর বিশেষ পক্ষপাত স্বপ্নের প্রতি, এ্যারিস্টটলের অগ্রহ নিতান্ত বাস্তবাশ্রয়ী ও বৈজ্ঞানিক কৌতুহল-পরিচালিত। চিকিৎসাশাস্ত্রীয় পারিবারিক পেশা তিনি গ্রহণ করেননি বটে, কিন্তু চিকিৎসকের বংশগত স্বভাবটি এনেছেন সঙ্গে করে—দর্শনের ক্ষেত্রে তিনি কল্পনার উপর নির্ভর করেন না, ভরসা করেন পর্যবেক্ষণ শক্তির উপর; কোন সিদ্ধান্তে আসতে সাহস পান না যতক্ষণ না লক্ষণ সম্পর্কে নিশ্চিত হন। কোথাও তিনি ভাবোচ্ছ্বাসে উচ্ছসিত নন; তাঁর মতবাদ সর্বত্রই প্রমাণ সমর্থিত, যুক্তিপরীক্ষিত। এই জন্যেই রাষ্ট্রব্যবস্থার পরিকল্পনা রচনাকালে প্লেটোর মত তিনি এক আদর্শ কল্পলোক সৃষ্টি করেননি, বিভিন্ন দেশের প্রচলিত শাসন-সংগবিধানগুলো তুলনা ও পরীক্ষা করে দেখেছেন। মানস-সংগঠনের দিক থেকে শিক্ষক ছাত্রের এই পার্থক্যকে আধুনিক মনোবিজ্ঞানের ভাষায় নির্দেশিত করতে চাইলে বলা যায় প্লেটো ছিলেন অন্তর্মুখী, এ্যারিস্টটল বহির্মুখী। প্লেটোর উৎসাহ নিজের অন্তর্লোকের দিকে তাকানোতে, এ্যারিস্টটলের আস্থা বহির্জগত অবলোকন করায়। দু'জনের বয়সের দূরত্ব অর্দ্ধশতাব্দীর, মনের দূরত্ব তার চেয়েও বেশী।

কিন্তু আগেই বলেছি এই তুলনার ভিত্তি এ্যারিস্টটলের পরবর্তী জীবনের রচনা; সোনালী নিঝ'র এর আওতার বাইরে। বাইরে থাক তাতে ক্ষতি নেই। তার কারণ, অনুমান করা যায় যে, সোনালী নিঝ'র সদৃশ রচনাবলীতে এ্যারিস্টটলের

স্বকীয়তা তেমন ভাবে ধরা পড়েনি যেমন পড়েছে পরবর্তীকালের সাদামাটা বৈজ্ঞানিক গ্রন্থসমূহে। জীবনের দ্বিতীয়ার্ধে বোধ হয় তিনি প্লেটো-প্রবর্তিত মতবাদগুলোর সত্যতায় সন্দিহান ও সন্দিগ্ধ হয়ে উঠেছিলেন, বোধ হয় তাই নিয়োজিত হয়েছিলেন নিজের মতামতকে পুনর্বিন্যস্ত করার কাজে। এই পুনর্বিন্যাস প্রচেষ্টা সম্ভবতঃ প্লেটোর মৃত্যুর পর শুরু হয় এবং লাইসিয়াম বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতাকালে বিশেষভাবে ফলপ্রসূ হয়ে ওঠে।

এই পর্যায়ের রচনায় তিনি প্রায়শ অধ্যাপকের মত একের পর এক বক্তব্য সাজিয়ে গেছেন। অনেক ক্ষেত্রেই ধরে নিয়েছেন যে, বিষয়টি পাঠকের পূর্বপরিচিত, বক্তব্যের অনুষঙ্গ অনুধাবন তার পক্ষে কষ্ট হবে না। তাঁর যে-সমস্ত রচনা সংরক্ষিত হয়েছে তাদের অনেকাংশই এ্যারিস্টটলের নিজের হাতে লেখা নয়, তাঁর বক্তৃতার অনুলিপি। ফলে বিভিন্ন সময়ে প্রদত্ত বক্তৃতা হয়ত একই শিরোনামার নীচে সংকলিত হয়েছে। সময়ের সঙ্গে তাঁর মতেরও রদবদল হয়েছে, পুরাতন বিষয়ে তিনি নতুন সত্য আবিষ্কার করেছেন। তদুপরি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যাখ্যাতা মূল রচনার সঙ্গে স্বকীয় ব্যাখ্যা, এমনকি মতও যোগ করে থাকবেন। এই জন্যেই দেখা যায় যে, এ্যারিস্টটলীয় রচনায় পুনরুক্তি আছে, কোথাও কোথাও স্ববিরোধিতা প্রকাশ পেয়েছে। সেই সঙ্গে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, দিনের প্রথম ভাগে ছাত্রদের উদ্দেশ্যে গুরুগম্ভীর জটিল বিষয়াদি নিয়ে অধ্যাপকসুলভ যে-সকল বক্তৃতা তিনি দিতেন তাদের অনুলিপিই শুধু রক্ষা পেয়েছে, সাধারন শ্রোতাদের জন্য বিকেলে পরিবেশিত আলোচনাগুলো বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

২

এ্যারিস্টটলীয় "কাব্যতত্ত্বের" অনুমানিক রচনাকাল খৃষ্টপূর্ব ৩৩০। অর্থাৎ এথেন্সে প্রথম ট্রাজেডি অভিনীত হওয়ার দু' শ' বছর এবং ট্র্যাজেডির শেষ কালজয়ী লেখকের মৃত্যুর ৭০ বছর পরে। ট্র্যাজেডির স্বর্ণযুগ ততদিনে অবসিত হয়েছে। আর সেই জন্যেই সময়টা ছিল "কাব্যতত্ত্ব" রচনার পক্ষে যথার্থঃ ট্র্যাজেডি রচনায় গ্রীক প্রতিভার মহোত্তম নিদর্শনগুলোকে তিনি পেয়েছিলেন তাঁর মতামত সংরচনার অবলম্বন হিসাবে। সাহিত্য বিষয়ে এ্যারিস্টটলের অন্য রচনার খবরও পাওয়া গেছে। যেমন, খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে প্রস্তুত এ্যারিস্টটলের রচনাবলীর তালিকায়

উল্লেখ আছে কয়েকটি পুস্তকের, যাদের নাম: "কাব্যজিজ্ঞাসা" (দুই খণ্ডে), "কবিদের সম্পর্কে" (তিন খণ্ডে), ও "হোমার পাঠের সমস্যা"। অনুমান করা হয় যে, "কাব্যজিজ্ঞাসার" প্রথম খণ্ড হল "কাব্যতত্ত্ব"; গ্রন্থটির বাকি দু'টি খণ্ড হারিয়ে গেছে, হয়ত সেখানে সাহিত্যের অন্যান্য শাখা, বিশেষ করে কমেডি, সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। "কবিদের সম্পর্কে" নামক পুস্তকে এ্যারিস্টটল হয়ত তথ্যসংগ্রহ করেছিলেন—যা এ্যারিস্টটলের পক্ষে স্বাভাবিক; সেই তথ্যসংগ্রহ থেকেই হয়ত "কাব্যতত্ত্বের" তত্ত্বসমূহ উদ্ভূত।

কাব্যকলার প্রতি কবি প্লেটোর যে-বিরূপতা ছিল "কাব্যতত্ত্ব"-কে তার জবাব বলে গণ্য করা চলে। প্লেটোর জবাব হিসাবেই "কাব্যতত্ত্ব" রচিত হয়েছে ভাবলে অবশ্যি অন্যায় হবে। "কাব্যতত্ত্ব" আসলে ছাত্রদেরকে কাব্যতত্ত্ব শেখানোর জন্য অধ্যাপকপ্রদত্ত বক্তৃতার অনুলিপি। কিন্তু এই বক্তৃতায় বৈজ্ঞানিক এ্যারিস্টটল তাঁর শিক্ষক কবি। প্লেটোর কাব্যবিদ্বেষের যে-উত্তর দিয়েছেন তা যে শুধু কাব্যের মর্যাদাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে তা-ই নয়, সেই সঙ্গে কাব্যকলার আবেদন ও স্বভাবকেও সুস্পষ্ট করে তুলে ধরেছে।

প্লেটোর আপত্তিগুলোকে দু'ভাগে ভাগ করা চলে। তাঁর মতে শিল্পমাত্রেই অনুকরণ। তাই যদি হয় তা'হলে কাব্য তথা শিল্পকলার প্রধান দুর্বলতা এই যে, কাব্য সত্য নয়, সত্যের ছায়া মাত্র। আদর্শরাজ্যের বিবরণ-গ্রন্থ "প্রজাতন্ত্রে" প্লেটোর মুখপাত্র সক্রেটিস শ্রোতাদের বলছেন,

> কথাটা ট্র্যাজেডির লেখকদের সরাসরি হয়ত বলা যাবে না; কিন্তু তোমাদের কাছে বলতে আমার বাধা নেই, কাব্যিক অনুকরণ শ্রোতাদের পক্ষে অতিশয় হানিকর। কেননা ঐ অণুকরণ সত্যকে চিনতে শেখায় না, বরং সত্য সম্পর্কে বিভ্রমের সৃষ্টি করে। কবি যে অনুকরণ করেন সেটা কিসের অনুকরণ?—বস্তুর; কিন্তু যে-বস্তুকে আমরা প্রতিদিন আমাদের চারপাশে দেখি তা সত্য নয়। বস্তু নিজেও একটা অনুকরণ বৈ নয়; সেই সত্যের সে অনুকরণ যা আছে অন্য এক ভাবলোকে।

বলে তিনি "প্রজাতন্ত্রের" ঐ দশম খণ্ডে উদাহরণ দিলেন বিছানার। ছুতার মিস্ত্রি যে-বিছানাটা তৈরী করল সেটা সত্য নয়, কেন না এ-বিছানা একটা সত্য

বিছানার অনুকরণ মাত্র—যে-বিছানার একটি মাত্র রূপ রয়েছে ভাবলোকে, এবং যার স্রষ্টা ঈশ্বর নিজে, যা পরিদৃশ্যমান জগতের বাইরে এক জগতে অবস্থান করে। তাই যদি হয়, কবি যে-বস্তুর অনুকরণ করছেন তা নিজেই যদি অন্য এক বস্তুর অনুকরণ হয়, তাহলে সত্যের সঙ্গে কাব্যের দূরত্ব দ্বিমাত্রিক। কাব্য ছায়ার ছায়া মাত্র। কাজেই কাব্যপাঠে সত্যের স্বরূপ অনুধাবন দূরে থাক সত্য সম্পর্কে উল্টো বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়, সত্য থেকে আমরা আরো এক ধাপ দূরে সরে দাঁড়াই। আর সত্যানুসন্ধানেই যেহেতু মনুষ্যত্বের পরিচয়, তাই কাব্যপাঠ নিঃসন্দেহে অতিশয় ক্ষতিকর কাজ।

এই প্রথম দফা আপত্তির সঙ্গে যোগ করা যায় আরো দু'টি জিজ্ঞাসা। প্লেটো তাঁর অন্য একটি গ্রন্থ "আইনসমূহ"তে দু'টি প্রশ্ন তুলেছেন শিল্পকলা সম্পর্কে। শিল্প-কলা মানেই যদি অনুকরণ হয় তাহলে একটি বিশেষ অনুকরণ অন্য অনুকরণের তুলনায় হীন কি উৎকৃষ্ট তা নিরূপনের নিরিখ কি হবে? প্লেটোর মতে নিরিখ হবে সত্যতা, অর্থাৎ কোন্ অনুকরণে কত বেশী সত্য ধরা পড়েছে তাই দিয়ে বিচার হবে তার উৎকর্ষের। দ্বিতীয়তঃ অনুকরণ সত্য হলেই কি চলবে, নাকি তাকে আনন্দদায়কও হতে হবে? এই প্রসঙ্গে প্লেটোর মত এই যে, আনন্দদায়ক হতে চাইলে শিল্পকলার পক্ষে অনুকরণ করা প্রয়োজন 'সুন্দরের', পরিহার করা আবশ্যক 'অসুন্দর'কে।

প্লেটোর দ্বিতীয় দফা আপত্তি সুপরিচিত। তাঁর ধারণা কাব্য সামাজিক কুফলের জন্ম দেবে। "প্রজাতন্ত্রে"র দ্বিতীয় খণ্ডে তিনি পুস্তকের উপর নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা চালু করার পক্ষে মত দিয়েছেন। যে-কোন ধরণের বই পাঠকের হাতে তুলে দেয়া যাবে না, ভালোমন্দ বাছাই করে দেখতে হবে, লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে খারাপ বই কিছুতেই পাঠকের করায়ত্ত না হয়। দুষ্ট পুস্তক পাঠে কি ধরণের কুফল ফলতে পারে তার নিদর্শনও দিয়েছেন তিনি। যেমন,

> কাব্যে দেখানো হয়েছে যে, দেবতারা অনেক সময় কদাচার প্রশ্রয় দেন। হোমারে এমন বিবরণ আছে যেখানে দেবতারা স্থূলভাবে ভোজনবিলাসী ও আসঙ্গলিপ্সু। অথচ তরুণ যারা তাদের শেখানো উচিৎ যে, দেবতারা অপাপবিদ্ধ, কুকর্মে অপারগ।

> কাব্য মানুষকে মৃত্যু সম্পর্কে ভীত করে, অথচ মানুষকে শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক সাহসের সঙ্গে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে।

> উচ্চস্বরে হাস্য করা অশোভন, অথচ হোমার নাকি দেবতাদের ঐ রকম ভাবে হাসতে শুনেছেন।

সব চেয়ে বড় আপত্তি অবশ্যি এই খানে যে, ট্র্যাজেডি সামাজিক ও নৈতিক শ্রেণীভেদকে বিপদগ্রস্ত করে—উচ্চ শ্রেণীর লোক যদি নিম্ন শ্রেণীর লোকের, পুরুষ মহিলার, সবল দুর্বলের, ভালো মন্দের অণুকরণ করে তা'হলে শ্রেণীভেদ থাকে না, একে অপরের সঙ্গে মিলে তালগোল পাকিয়ে তোলে; অথচ প্লেটোর আদর্শ রাজ্যে শ্রম ও শ্রেণীবিভাগ না থাকলেই নয়ঃ শাসনকর্তা শাসন করবেন, যোদ্ধা যুদ্ধ করবেন, প্রজা দ্রব্য উৎপাদন করবে—এই হল ব্যবস্থা, এই ব্যবস্থার ব্যাঘাত যদি ঘটে—প্রজা যদি শাসনকর্তা হতে চায়, মুচি যদি ইচ্ছা করে ওস্তাগার হবে, অথবা তাঁতি ছুতার মিস্ত্রি, তা'হলে দুরবস্থার ও দুর্ভাগ্যের অবধি থাকবে না। অন্যদিকে সৎ যদি অসতের অনুকরণ করে তাহলেও সৎ ও অসতের ভেদরেখা স্পষ্ট রাখা যাবে না, অসতের অণুকরণে সতের সততা হয়ত নিষ্কলুষ থাকবে না, সমাজ-বাদী সমালোচকরা প্লেটোর এই মনভঙ্গিকে ফ্যাসিষ্ট বলে চিহ্নিত করেছেন, মন্তব্য করেছেন যে মানুষের সুপ্ত চেতনাগুলোর জাগরণকে তিনি ভয় করেন, কেননা সে-জাগরণে তাঁর শ্রেণীশৃংখলিত সমাজব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়বে।

সামাজিক কুফলের যে অভিযোগ প্লেটো করেছেন সেটা প্রত্যেকযুগেই নীতিনিষ্ঠদের মুখে নুতন করে উচ্চারিত হয়েছে। এ-আপত্তি তাই প্লেটোর একার নয়, নীতি-বোধের সামাজিক স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বিগ্ন অনেক সমাজহিতৈষীরই।

সে যাইহোক, এই দুই পর্যায়ের আপত্তির কারণে কবিদের প্রতি করণীয় কর্তব্য সম্বন্ধে তার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন এই ভাবেঃ

> অভিনয়কুশলী এই সব মহোদয়দের—যাঁরা এতটা দক্ষ যে সব কিছুরই অনুকরণ করতে পারেন—কেউ যদি আমাদের কাছে এসে প্রস্তাব করেন যে, নিজেকে এবং নিজের কাব্যকলাকে প্রদর্শিত করবেন, তা'হলে আমরা হাঁটু গেড়ে বসব, বসে মিষ্টি, পবিত্র ও চমকপ্রদ লোক হিসাবে তাঁকে সম্মান করব, কিন্তু সেই

সঙ্গে এও তাঁকে জানিয়ে দেব যে, আমাদের রাষ্ট্রে তাঁর মত লোকের ঠাঁই নেই, আইনের নিষেধ আছে তাঁকে রাখার ব্যাপারে। এবং অতঃপর সুগন্ধি দিয়ে তাঁকে আমোদিত করে, তাঁর মাথায় পশমের মালা পরিয়ে, আমরা তাঁকে ভিন্ন শহরের পথ দেখিয়ে দেব।

"প্রজাতন্ত্রে"র দশম খণ্ডে কাব্যরসিকদের প্রতি একটা চ্যালেঞ্জও জানিয়েছেন প্লেটো ঃ

কবিদের নিজেদের নয়, তাঁদের সমর্থক ও অনুরাগীদের আমরা একটা সুযোগ দেব কাব্যের স্বপক্ষে গদ্যে লিখতে এবং প্রমাণ করতে যে, কাব্য শুধু সুমিষ্টই নয়—সুমিষ্ট যে সে তো আমরা ভালো করেই জানি—সেই সঙ্গে সমাজের পক্ষে, সাহসের পক্ষে কল্যাণকরও বটে। আমরা অনুরাগ ভরে কবিতা শুনব। কেননা সমাজের পক্ষে কাব্যের কল্যাণকারিতা স্বপ্রমাণ হলে আমরা ধরেই নিচ্ছি যে, কাব্যপাঠে আমাদের উপকার হবে।

এই চ্যালেঞ্জের কথা এ্যারিস্টটল জানাতেন। আরো অনেক কিছুর সঙ্গে "কাব্যতত্ত্বে" এই চ্যালেঞ্জের একটা সদুত্তরও আছে। কাব্য যে অনুকরণ একথা এ্যারিস্টটলও মানেন, কাব্য তথা শিল্পকলাকে তিনি অনুকরণ বলেই অভিহিত করেছেন। কিন্তু কাব্য যে-বস্তুর অনুকরণ তা সত্য কি মিথ্যা এ নিয়ে তিনি কোন উদ্বেগ প্রকাশ করেননি। কেননা অনুকরণ মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি, সহজাত প্রবণতা; তাই অনুকরণের বিষয় সত্যই হোক আর মিথ্যাই হোক অনুকরণ মানুষ করবেই। মানুষ নিজে অনুকরণ করতে ভালোবাসে এবং অন্যের অনুকরণ দেখে আনন্দ পায়। আরো একটি প্রবৃত্তি আছে মানুষের ভেতর ঃ ছন্দস্পন্দ ও সুরসঙ্গতিতে আনন্দ লাভ, যে-ছন্দস্পন্দ ও সুরসঙ্গতি কাব্যের উপাদান এবং যা আছে বলে কাব্যপাঠে মানুষের আগ্রহ। মানুষ যেহেতু দেবতা হয়ে যাবে না কোন দিন, পশুও হয়ে পড়বে না সহসা, তাই এই দু'টি প্রবৃত্তি তার ভেতর থাকবেই। এবং যতদিন মানুষ থাকছে ততদিন কাব্য-কলারও বিনষ্টি নেই। তাই যদি হয় তা'হলে কাব্যের পক্ষে বা বিপক্ষে কথা বলা নিস্ফল। যা থাকবেই তা মেনে না নিয়ে উপায় কি?—কথাগুলো এ্যারিস্টটল এমন খোলাখুলি বলেননি, কিন্তু তাঁর বক্তব্যের ধারা এই রকমই।

তবু যদি সত্য-মিথ্যার তর্ক ওঠে তাহলে এ্যারিস্টটল স্বীকার করবেন যে, সাহিত্যে মিথ্যার স্থান গৌণ নয়। হোমার কবিদের মধ্যে যেমন শ্রেষ্ঠ, মিথ্যুকদের মধ্যেও

তেমনি। কিন্তু সাহিত্যান্তর্গত মিথ্যার একটি বৈশিষ্ট্য আছে। "অবিশ্বাস্য সম্ভবের চাইতে কবির পক্ষপাত থাকা উচিৎ বিশ্বাস্য অসম্ভবের প্রতি"। অর্থাৎ লক্ষ্য রাখতে হবে পাঠকের বিশ্বাস উৎপাদনের দিকে। যে-মিথ্যা পাঠকের আস্থা অর্জনে অসমর্থ সে-মিথ্যা নিস্ফল। অবিশ্বাস্য সম্ভবের সঙ্গে বিশ্বাস্য অসম্ভবের এই পার্থক্যটিকে তিনি যে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করেন তা বোঝা যায় "কাব্যতত্ত্বে" মাত্র কয়েক পৃষ্ঠার ব্যবধানে এর পুনরুক্তি দেখে। অন্যত্র তিনি মন্তব্য করেছেন যে, অবিশ্বাস্যকে রাখা ভালো গল্পের বাইরে। পাঠকের আস্থা অর্জনের কথাটি অনেক শ' বছর পরে অনেক দূরের এক দেশের কবি, কোলরিজ, সুন্দর করে বলেছেন; বলেছেন কাব্যের সত্য আর কিছুই নয়, পাঠককে বাধ্য করা তাঁর অবিশ্বাসকে সাময়িকভাবে স্থগিত রাখতে। এ অবশ্যি সকল সার্থক মিথ্যাবাদীর সকল মিথ্যা কথা সম্পর্কেই সত্য। কিন্তু দ্বিতীয় একটি সত্য আছে সাহিত্যের মিথ্যায়, গর বিচারে মিথ্যুকের মিথ্যা থেকে সে স্বতন্ত্র। অনাবশ্যক মিথ্যা কথা কোন কবি কখনো বলেন না ঃ এ্যারিস্টটলের ভাষায়, "অসম্ভবকে সমর্থন করতে হবে শিল্পের প্রয়োজনে; বা উচ্চতর বাস্তবের, অর্থাৎ যেমনটি হওয়া উচিৎ সেই আদর্শরূপের অংশ হিসাবে; অথবা প্রচলিত ধারনার উল্লেখ করে।" তার মানে মিথ্যার জন্য মিথ্যা বলা নয়, ততটুকুই বলা যতটুকু অপরিহার্য। তৃতীয়তঃ এবং এটাই সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ—সাহিত্যের মিথ্যা খাঁটি সত্যের চেয়েও সার্বজনীন। এই খানেই ইতিহাসের সঙ্গে কাব্যের প্রধান পার্থক্য। ইতিহাসের বিষয় হল যা ঘটেছে; কাব্যেব উপজীব্য যা ঘটতে পারে, সম্ভাব্যতা ও আবশ্যকতার নিয়মের ভেতর ঘটা সম্ভব এমন ঘটনা। যা ঘটেছে তা একটি বিশেষ স্থান ও কালের সীমায় ঘটেছে, যা ঘটা সম্ভব তা যে-কোন স্থানে যে-কোন কালে ঘটতে পারে। একটি তাৎস্থানিক ও তাৎক্ষণিক; অপরটি সার্বজনীন ও সর্বকালিকঃ একটি বিশেষ, অপরটি নির্বিশেষ। কূটতার্কিক বিচারে তাই কাব্যের বিষয়বস্তুকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হয়তো অসম্ভব নয়, কিন্তু এ তেমন মিথ্য যা ইতিহাসের সত্যের চেয়ে অনেক বেশী ব্যাপক ও বিস্তৃত এবং সেই কারণে অনেক বেশী সত্যাশ্রয়ীও বটে।

প্লেটোর প্রথম পর্যায়ের আপত্তির সঙ্গে যে-দুটি আনুষঙ্গিক প্রশ্নের উল্লেখ করেছি তাদের যথাযথ উত্তরও এ্যারিস্টটলে আছে। অনুকরণ কতটা সত্যনির্ভর অর্থাৎ তার বিষয়বস্তু কতটা সত্য ও অনুকরণ সেই সত্যের কতটা নিকটবর্তী তা দিয়ে অনুকরণের মূল্য নিরুপন করার আবশ্যকতা নেই, কেননা অনুকরণ নিজে যদি সুন্দর হয় তাহলে

সেটাই শ্রোতার পক্ষে যথেষ্ট আনন্দের কারণ হবে। আনন্দ দেওয়ার জন্য অনুকরণ অসুন্দরকে পরিহার করে শুধু সুন্দরের উপরই দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখবে এ বিধান ও এ্যারিস্টটল মানেন না; তাঁর মতে কুৎসিতের অনুকরণও সুন্দর হতে পারে, এবং সুন্দর বলে তা পারে আমাদের আনন্দ দিতে।

অবশ্যি নীতির ব্যাপারে গুরুর সচেতনতা শিষ্যেও অনুপস্থিত নয়। কমেডির তুলনায় এ্যারিস্টটল ট্র্যাজেডিকে শ্রেষ্ঠতর বিবেচনা করেন, কেননা কমেডি হীনতর লোকদের অনুকরণ, ট্র্যাজেডির বিষয় সাধারণের চেয়ে মহত্তর চরিত্র। ট্র্যাজেডির নায়ক-চরিত্রে মহত্ত্ব যে অত্যাবশ্যক একথা তিনি জোর দিয়ে বলেছেন। ইউরিপিডিস তাঁর একটি নাটকে মেনেলুসকে যে অপ্রয়োজনে কলঙ্কচিহ্নিত করেছেন তা এ্যারিস্টটলের অনুমোদন লাভ করেনি। নিজের সামান্য একটু দুর্বলতার জন্য ট্র্যাজেডির নায়ক অনেক দুর্ভোগ সহ্য করেন; কিন্তু দুর্ভোগ সত্ত্বেও ট্র্যাজেডি মানুষের শক্তিরই আলেখ্য, দুর্বলতার নাট্যরূপ নয়।

নায়কের এই মহত্ত্বের ভেতরই নিহিত আছে ট্র্যাজেডির প্রধান নৈতিক শক্তি। ট্র্যাজেডিতে নায়কের অসামান্য দুর্ভোগ দর্শনে দর্শকের মনে দু'টি ভাবের উদ্রেক করেঃ করুণা ও ভীতি। সামান্য ত্রুটির জন্য অসামান্য দুর্ভোগ তথা মহত্ত্বের বিনাশ দর্শনে নায়কের জন্য করুণার সৃষ্টি হয় এবং শক্তিমান হওয়া সত্ত্বেও ঐ দুর্ভোগের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে নায়ক যে নিতান্ত শক্তিহীন ও অসহায় এই বোধ থেকে জন্ম নেয় একটা আতঙ্ক। এ্যারিস্টটল বলেছেন ট্র্যাজেডি দর্শনেও শ্রবনে আমাদের মনে এই অনুভব দু'টির বিমোক্ষণ সম্পন্ন হয়।

'বিমোক্ষণ' কথাটির অর্থ নিয়ে অনেক তর্ক হয়েছে। দু'ধরণের অর্থ চালু আছে। এক বিমোক্ষণ হল পরিশোধন। করুণা ও ভীতির অনুভব যে শুধু জাগ্রত হয় তা নয়, তারা পরিশোধিত ও হয়। দৈনন্দিন জীবনে আমরা কেনা করুণায় সিক্ত হই, কেনা আতঙ্কিত হই ভয়ে! কিন্তু সে-করুণা ও ভীতির সঙ্গে স্বার্থ জড়িত থাকেঃ নিজের ক্ষতি বা বিপদে যে-করুণা ও ভীতির উদ্রেক হয় তা স্বার্থপরতার কালিমায় মলিন। অন্যদিকে ট্র্যাজেডিতে নায়কের দুর্ভোগ দর্শনে যে-করুণা ও ভীতির জাগরণ ঘটে তাতে ব্যক্তিগত স্বার্থের ছাপ নেই—তা আত্মস্বার্থমুক্ত, অপরের দুর্ভোগজাত। ট্র্যাজেডির নায়ক আমার আত্মীয় নন, স্বজন নন। তার মানে ট্র্যাজেডি আমার করুণা ও ভীতিকে পরিশোধিত করল স্বার্থের মালিন্য থেকে।

দুই, বিমোক্ষণ হল চিকিৎসাশাস্ত্রীয় রূপক। এই দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটিই অধিক প্রচলিত ও গ্রহণযোগ্য। এই ব্যাখ্যা অনুযায়ী চিকিৎসক যেমন মানুষের শরীর থেকে দূষিত রক্ত ক্ষরণ করায় রোগীর স্বাস্থ্যগত কারণে, ট্র্যাজেডিও তেমনি মানসিক স্বাস্থ্য অটুট রাখার প্রয়োজনে পাঠকের মন থেকে করুণা ও ভীতির অনুভব দু'টিকে নির্গত করে দেয়।

দূষিত রক্তের মত অবরুদ্ধ করুণা ও ভীতি বিপজ্জনক বস্তু। মনের ভেতর দীর্ঘকাল চাপা পড়ে থাকলে করুণা ও ভীতি বাঁধের মুখে পানির প্রবল উচ্ছ্বাসের মত বিপদ বাধাতে পারে। ট্র্যাজেডির প্রধান কাজ এই প্রচণ্ড অনুভূতি দু'টির নির্গমনের জন্য আবশ্যক পথ তৈরী করা, এবং নির্গমন সম্ভব হলে মনে যে-উপশম-জনিত আনন্দের সৃষ্টি হয় তা সরবরাহ করা। টেনিসনের একটি কবিতায় একজন সদ্যবিধবার বর্ণনা আছে। যুদ্ধে নিহত স্বামীর লাশের কাছে স্তব্ধ বসে আছেন মহিলা। অজ্ঞান হয়ে যাননি; ভেঙ্গে পড়ছেন না কান্নায়। সঙ্গিনীরা মুখ চাওয়া চাওয়ি করছেন—এতো ভীষণ কথা একে কাঁদাতে হবে, নয়ত জমাট শোকে বিদীর্ণ হয়ে যাবে এর হৃদয়। মৃদু কণ্ঠে তাঁরা অনেক রকম প্রশংসা করলেন মৃত স্বামীর। কিন্তু মহিলা নির্বাক ও নিস্তব্ধ। শেষে নব্বই বছরের এক দাই উঠে এলেন, মহিলার ছেলেটিকে এনে রাখলেন ওঁর কোলে। অমনি শ্রাবণধারার মত অশ্রু নামল বিধবার দুচোখ বেয়ে, ক্রন্দনবিধুরা বললেন, "আমার সন্তান, তোর জন্যেই তো আমাকে বেঁচে থাকতে হবে। কান্নার মধ্য দিয়ে শোকের এই যে উপশম এ যদি না ঘটতো তাহলে স্বামীহারা ঐ মেয়েকে আর বাঁচানো যেত না। এই উপশমের পথ আনন্দ সৃজনই হল ট্র্যাজেডির আরব্ধ কর্ম। "কাব্যতত্ত্বে"র ইংরেজ ভাষ্যকারেরা কবি বায়রণের একটি চিঠির উদ্ধৃতি দিয়ে থাকেন; এই চিঠিতে কাব্যকে বায়রণ বলেছেন তেমন এক "লাভাস্রোত যার স্মরণে ভূমিকম্প রহিত হয়"। এই বিবরণ ট্র্যাজেডির অবদার সম্পর্কেও সত্য। করুণা ও ভীতির অবদমনজনিত কুফল ব্যক্তিকে ছাড়িয়ে সমাজকেও বিপন্ন করতে পারে। অবরুদ্ধ অনুভূতিগুলো একদিন প্রচণ্ডভাবে বিস্ফোরিত হতে পারে সামাজিক উপপ্লব কি বিশৃঙ্খলার আকারে।

এই ভাবে ট্র্যাজেডি মানুষের উপকার করে। গ্রীক ট্র্যাজেডি অভিনীত হত বছরের একটি বিশেষ ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সময়, অর্থাৎ নাগরিকদের সুযোগ ছিল নিয়-মিত বিরতিতে করুণা ও ভীতির বিমোক্ষণ লাভ করার। নীতির ক্ষেত্রে ট্র্যাজেডির

ভূমিকা এ্যারিস্টটল এ ভাবেই নিরূপন করেন। ট্র্যাজেডি আমাদের সুস্থ রাখে, যাতে আমরা অকারণে উত্তেজিত না হই, ভাবাবেগে উন্মত্ত না হয়ে পড়ি, যাতে নিজের শাসন অব্যাহত রাখতে পারি, বিমোক্ষণের মধ্য দিয়ে ট্র্যাজেডি আমাদের সে-ভাবে প্রস্তুত করে। প্লেটোর চ্যালেঞ্জের উত্তর হিসাবে গ্রহণযোগ্য এই বক্তব্যের ভেতর যে-সত্যের উল্লেখ আছে তার সত্যতা নিয়ে বিগত আড়াই হাজার বছরে সন্দেহ যে কখনো ওঠেনি তা নয়, কিন্তু কোন সন্দেহই তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে পারেনি। সমালোচক হিসাবে এ্যারিস্টটলের একটা বড় কৃতিত্ব এই খানে।

কাব্যবিচারে গুরুশিক্ষকের ভেতর আরো একটা পার্থক্য আছে। প্লেটো অনুপ্রেরণায় আস্থাশীল। "আইঅন" গ্রন্থে তাঁর একটি স্মরণীয় উক্তি ঃ

> ... কাব্যলক্ষ্মী প্রথমেই মানুষকে অনুপ্রাণিত করে নেন ··· কেননা যে-সকল মহৎ কাব্যের আমরা অনুরাগী তাদের স্রষ্টারা শিল্পের কোন আইন শিক্ষা করে সৃষ্টির এই উৎকর্ষ লাভ করেননি, তাঁদের কণ্ঠে কবিতার অনবদ্য চরণগুলো যে ধ্বনিত হয়ে উঠেছে সেটা বিশেষ বিশেষ অনুপ্রেরণার মূহূর্তে, সেই বিশেষ সময়ে যখন তাঁদের উপর বাইরের কোন শক্তি এসে ভর করেছে। গীতি কবিতার রচয়িতারা তাঁদের প্রশংশিত গানগুলো রচনা করেন তখন যখন আধিদৈবিক উন্মত্ততায় তাঁদের পেয়ে বসে ··· অতিপ্রাকৃতিক আবেশের তেমন ক্ষণে তাঁদের মনে বৃন্দস্পন্দ ও সুরসঙ্গতির যে-উত্তেজনা সৃষ্টি হয় তাকেই তাঁরা প্রকাশ করেন শ্রোতাদের কাছে।... কেননা কবি মাত্রেই একটি অতিশয় হাল্কা, উড়ন্ত ও পবিত্র সত্তা এবং কবির পক্ষে কোন উদ্ভাবনাই সম্ভব নয় যতক্ষণ না তিনি অনুপ্রাণিত হয়েছেন, হয়ে পড়েছেন উন্মত্ত ; যতক্ষণ বুদ্ধি সুস্থ আছে ততক্ষণ একটি চরণও রচনা করা সম্ভব নয় তাঁর পক্ষে।

কাব্য অনুপ্রেরণার আবশ্যকতা সম্পর্কে এ্যারিস্টটলও অনবহিত নন। "কাব্যতত্ত্বে" তিনি বলেছেন, "কবির পক্ষে একটা বিশেষ গুণ বা খানিকটা উন্মাদনা থাকা আবশ্যক।" কিন্তু এই পর্যন্তই, এর বেশী নয়। কবিকে তিনি সুস্থবুদ্ধির ক্রীড়াবিরহিত উন্মাদ মনে করেননি। কাব্যকলা সকল প্রকার আইন-কানুনের উর্দ্ধে এক আধিদৈবিক, রহস্যময় অন্ধকার অনুপ্রেরণার বস্তু, তাই সচেতন ভাবে কাব্য রচনার চেষ্টা করা না করা, তার রীতিনীতি জানা বা না জানা নিতান্ত অর্থহীন — শিক্ষকের এই

মত ছাত্র গ্রহণ করতে পারেননি। অনুপ্রেরণা যেমন সত্য, রীতিনীতি আইনকানুনও তেমনি সত্য; অনুপ্রেরণার যেমন আবশ্যকতা আছে, তেমনি প্রয়েজন আছে কলা-কৌশল মেনে চলার।

দৃষ্টিভঙ্গির এই পার্থক্যের একটা কারণ এই যে, অন্তর্মুখী প্লেটো কবির আত্মার দিকে চেয়েছেন, বহির্মুখী এ্যারিস্টটল অবলোকন করেছেন কবির সৃষ্টিকে। কেমন ধরণের মানুষ কবিতা সৃষ্টিতে সক্ষম এই হল প্লেটোর বিবেচ্য, কবিতার স্বভাব ও প্রকৃতি কেমন — এটি এ্যারিস্টলের জিজ্ঞাসা। কি করে কোন প্রক্রিয়ায় কাব্যরচনার মানসিকতা কবির মধ্যে সৃষ্টি হয় তা নির্ধারণ করা এ্যারিস্টটলের এলাকার বাইরে, তাঁর দায়িত্ব কবিতা লেখা হয়ে যাওয়ার পর কবিতাটিকে বিশ্লেষণ করা, তার আভ্যন্তরিক শৃঙ্খলা ও বিন্যাস, উপাদান ও সংগঠন, অন্য কবিতার সঙ্গে তার সাদৃশ্য বৈসাদৃশ্য, তার বিশিষ্ট অবদান -- ইত্যকার বস্তুগুলো নির্ণয় করা। এই জন্যেই যে-হোমারও সফোক্লিসের রচনার তিনি উচ্চকণ্ঠ প্রশংসা করেছেন লোক হিসাবে তাঁরা কেমন ছিলেন সে-বিষয়ে কোন সংবাদ "কাব্যতত্ত্বে" পাওয়া যায় না।

কাব্যকলাকে এ্যারিস্টটল যে রহস্যময় অন্ধকার রাজ্য বলে গণ্য করেননি এই সত্যে তাঁর কাব্য সমালোচনার প্রধানতম ঐতিহাসিক মূল্য নিহিত। অল্পসল্প কাব্য সমালোচনা এ্যারিস্টটলের পূর্বেও ছিল। প্লেটো তো বটেই, এ্যারিস্টফিনিসের 'ব্যাঙ' শীর্ষক কমেডিতে, এমনকি হোমারের রচনাতেও, কাব্য—তথা শিল্প-সমালোচনার প্রক্ষেপ আছে। তবু এ্যারিস্টটলকেই বলা হয় সমালোচনাশাস্ত্রের জনক। কারণ তিনিই প্রথম সমালোচক যিনি কাব্যবিচারকে কাব্যপাঠের মতই গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করেছেন। কাব্যপাঠ মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি, কাব্য জিজ্ঞাসাও তা-ই একটি স্বতন্ত্র শাস্ত্র। তাঁর সমালোচক মতগুলি প্রক্ষিপ্ত মন্তব্য মাত্র নয়, বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় লব্ধ ও শৃঙ্খলার সঙ্গে বিন্যস্ত একটি পাঠ্যবিষয়। লাইসিয়ামে তিনি ছাত্রদের যেমন শিক্ষা দিতেন জীববিজ্ঞান কি, তর্কবিদ্যা কি, রাষ্ট্রনীতি কি, ঠিক তেমনি ভাবে পাঠ দিতেন কাব্যতত্ত্বের। নীতিশাস্ত্র, পদার্থবিজ্ঞান, মনোবিদ্যা তথা জীবন ও জগতের সকল পরিচিত এলাকার বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণক্ষেত্রে যে-শৃঙ্খলা তিনি আনয়ন করেছিলেন কাব্যপাঠের ক্ষেত্রেও তেমন একটা সুবিন্যস্ত বিচারপ্রণালী প্রতিষ্ঠা ছিল তাঁর অভীষ্ঠ এবং সে-কাজে তিনি অবিস্মরণীয় সাফল্য অর্জন করেছিলেম সন্দেহ নাই।

তার চেয়ে বড় কথা, কাব্যশাস্ত্রকে তিনি নীতিশাস্ত্রের হুকুমবরদারি থেকে মুক্ত করেছিলেন। বলেছি প্লেটোর সঙ্গে এ-বিষয়ে তাঁর ভীষণ রকম পার্থক্য। কবি সত্য কথা বলছেন কি মিথ্যা কথা বলছেন, এটা স্থির করা সমালোচকের দায়িত্ব নয়, সমালোচকের কাজ নিরূপম করা মিথ্যা কথা কি ভাবে সুন্দর করে বলতে হয় কবির তা জানা আছে কিনা, এবং কবির মিথ্যা কথায় সার্বজনীন সত্য ধরা পড়েছে কতটা। বিষয়বস্তুর গুণাগুণ দিয়ে কাব্যের উৎকর্ষ-অপকর্ষ নির্ধারিত হয় না; কাব্যের উৎকর্ষ নির্ভর করে অনুকরণ-দক্ষতার উপর। অর্থাৎ কাব্যের বিচার হবে কাব্যের মানদণ্ডে। দেখতে হবে কবি কোন ধরণের আনন্দ আমাদের দিতে চাচ্ছেন, তারপরে প্রশ্ন উঠবে সেই বিশেষ ধরণের আনন্দদানে তাঁর দক্ষতা কতটা। সব রূপকল্প সব ধরণের আনন্দ দেয় না, একেক ধরণের কবিতা একেক রকমের আনন্দ দেবে, এবং ঐ বিশেষ রূপকল্পে লিখিত যে-কোন রচনার সাফল্য নির্ভর করবে পাঠকের মনে উদ্দিষ্ট আনন্দ সৃজনের উপর। এ-ভাবে কাব্যপাঠ অব্যাহতি পেল নীতি-শাস্ত্রের পশ্চদানুসরণের হাত থেকে, সে স্বতন্ত্র ও স্বনিয়ন্ত্রিত হয়ে উঠল। শুধু নীতিশাস্ত্র নয়, কাব্যবিচারে অন্য কোন শাস্ত্রের কর্তৃত্বও তিনি মানেন না; তাই বলেছেন ত্রুটিহীনতার মান একেক বিষয়ে একেক রকম। অর্থাৎ বিষয়ের মানদণ্ডে নিরূপিত কাব্যটি বিবেচনাগ্রাহ্য নয়।

এতো গেলো সমালোচক এ্যারিস্টটলের ঐতিহাসিক মূল্য,। তাঁর স্থায়ী মূল্যও কম নয়। এ্যারিস্টটলের সমস্ত মতামতও যদি ভ্রান্ত হতো — তারা অবশ্যিই নয় — তাহলেও তাঁর সমালেচেনার গুরুত্ব থাকতো, তিনি সমালোচনা-পদ্ধতি শিখিয়েছেন বলে। পর্যবেক্ষণ, বিশ্লেষণ. তুলনা, শ্রেণীকরণ ও সাধারণীকরণের যে-কৌশল তিনি অন্যান্য শাস্ত্রতত্ত্বে ব্যবহার করেছেন কাব্যসমালোচনায় তাদের কিভাবে প্রয়োগ করা যায় তার নিদর্শনও তিনি রেখে গেছেন। তাঁর সামনে সমালোচনার কোন আদর্শ ছিল না, ছিল না কোন পরিভাষাও, শুধু নাটকগুলো ছিল — তাদের ভেতর থেকেই সমালোচনার সূত্রসমূহ বার করে এনেছেন তিনি। এ ব্যাপারে কোন স্বকপোলকল্পিত পূর্বসিদ্ধান্ত নিয়ে কাজ সুরু করেননি তিনি ঃ অবরোহন না করে আরোহন করেছেন। এই আত্মনিরপেক্ষ বিষয়-মুখীনতার কারণেই তাঁর জিজ্ঞাসার মূল্য কখনো কমবে না। ড্রাইডেন মন্তব্য করেছিলেন যে, এ্যারিস্টটল যদি শেক্সপীয়রের নাটকের সঙ্গে পরিচিত হতেন তাহলে এখন যে তাঁর মতামত-গুলোর মধ্যে শেক্সপীয়রের স্থানসংকুলান হয় না এমন একটা পরিস্থিতি কখনো

সৃষ্টি হত না। তাঁর ধারণার রদবদল হত, সম্প্রসারণ ঘটত সিদ্ধান্তের। তাই বলা হয়ে থাকে এ্যারিস্টটলের ধারণাগুলো অসত্যও যদি হতো তবু তাঁর জিজ্ঞাসার মূল্য স্বীকার না করে উপায় ছিল না। শিল্পকলা কি, এক ধরণের শিল্পের সঙ্গে অন্য ধরণের শিল্পের তফাৎ ঘটতে পারে কি কি বিষয়ে 'এসব প্রসঙ্গ থেকে ট্র্যাজেডির কাব্যভাষাতে বিশেষ্য বা ক্রিয়া পদ কতটা ও কেমন ভাবে থাকবে এ-পর্যন্ত সমুদয় প্রসঙ্গে যে-সকল জিজ্ঞাসা এ্যারিস্টটল সর্বপ্রথম উত্থাপন করেন আজো তাদের জবাব খোঁজার বিরাম নেই। ট্র্যাজেডির রূপকল্প যে গ্রীক ট্র্যাজেডিতেই তার পূর্ণাঙ্গতা লাভ করেছিল এমন দাবী এ্যারিস্টটল করেননি। বলেছেন সেটা ভিন্ন এক জিজ্ঞাসা। অথাৎ ট্র্যাজেডির বিবর্তন গ্রীক ট্র্যাজেডির পরও সম্ভবপর ছিল কিনা এই বিষয়ে তিনি খোলামন। তাই যদি ধারণা করা হয় যে, শেক্সপীয়রীয় ট্র্যাজেডি এই রূপকল্পের বিবর্তন ধারায় একটি পরবর্তী স্তর তাহলে অন্যায় করা হয় না। এবং তখন এটাও বোঝা যায় যে, ট্র্যাজেডির আলোচনায় তাঁর কথাই চূড়ান্ত এমন বিশ্বাস আর যারই থাক এ্যারিস্টটলের ছিল না।

সে যাই হোক নিজের উত্থাপিত প্রশ্নগুলোর যে-জবাব এ্যারিস্টটল নিজে দিয়ে গেছেন তাদের সকলের গুরুত্বই এখনো অম্লান, অনেক কটির সত্য সম্পুর্ণ অসংশয়িত। যেহেতু মধ্যযুগের বিবেচনায় এ্যারিস্টটল ছিলেন প্রকৃতি ও বাইবেলের মতই অভ্রান্ত, তাই সে-কালের অত্যুৎসাহী সমালোচকেরা এ্যারিস্টটলের মতামতকে আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করেছেন। ভক্তিপ্রবণ ভাষ্যকারেরা তিনি যা বলেছেন তার সঙ্গে যা বলেননি তাও যুক্ত করে নিয়েছেন। যেমন, ট্র্যাজেডিতে এ্যারিস্টটল অত্যাবশ্যকীয় বলেছেন শুধু কর্মের ঐক্যকে, সময়ের ঐক্যের কথা উল্লেখ করেছেন মাত্র একবার, স্পষ্ট করে উল্লেখ করেননি স্থানিক ঐক্যের। কিন্তু ভাষ্যকাররা নির্দেশ দিয়েছেন কর্মের ঐক্য তো থাকবেই, সময়ের এবং স্থানের ঐক্যও চাই ঃ একদিনের অধিক সময়ের বিবরণ থাকবে না ট্র্যাজেডিতে, রদবদল চলবেনা অকুস্থলের। শুধু মধ্যযুগ বলে নয়, ষোড়শ শতাব্দীতেও সমালোচক বেনজনসন নাট্যকার শেক্সপীয়রকে নিয়ে ঠাট্টামস্করা করেছেন শেক্সপীয়রে সময় ও স্থানের ঐক্য নেই বলে। এই অতিভক্তি ও অতিউৎসাহে কিন্তু এ্যারিস্টটলের প্রতি যথার্থ সম্মান প্রকাশ পায়নি। মনের সদা-সংশয়শীলতা ও অবাধ উন্মুক্ততা নিয়ে এ্যারিস্টটল যেখানে সব সময়ে একজন কৌতূহলী অনুসন্ধানব্রতী সেখানে একজন আত্মসিদ্ধান্তসুনিশ্চিত নির্দ্বন্দ্ব প্রচারকের মূর্তি প্রতিষ্ঠায় বরং এ্যারিস্টটলের অবমাননাই ঘটে।

এ্যারিস্টটল মধ্যযুগের সমালোচকদের কাছে যেমন, ক্ল্যাসিসিকমপন্থী সমালোচকদের নিকটও তেমনি অবশ্যমান্য। তাঁর অনুকরণতত্ত্ব ক্লাসিসিজমের প্রধানতম ভিত্তি। অনুকরণকে তিনি বলেছেন মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। এনিয়ে বিতর্ক নেই। কিন্তু অনুকরণই যে কাব্য তথা শিল্পকলার মূল বস্তু এই মত রোমান্টিকরা মানতে চান না; কেননা এ-মতে ব্যক্তি মনীষা ও সৃজন-ক্ষমতার যথাযোগ্য মর্যাদা নেই। পাখির কুজনের মত, গাছের ফুলের মত কাব্য আপনার স্বভাবে, কবির রহস্যাবৃত অন্তর্লোক থেকে উৎসারিত হয়। কিন্তু এ্যারিস্টটল তো অনুপ্রেরণাকে অস্বীকার করেননি। তদুপরি, গ্রীক ভাষায় 'কবি' শব্দের অর্থই হ'ল 'স্রষ্টা'। অনুকরণ বলতে এ্যারিস্টটল বস্তুর অবিকল অনুকৃতি বোঝাননি, এ্যারিস্টটলীয় অর্থে অনুকরণ হল কল্পনার সাহায্যে প্রতিকল্প সৃজন। বৈজ্ঞানিকের সঙ্গে কবির প্রকৃত পার্থক্য এটা নয় যে, একজন গদ্যে লেখেন অন্যজন পদ্যে; তফাৎ এইখানে যে, কবি একজন অনুকারক, বৈজ্ঞানিক আর যাই হোন অনুকারক নন: শুধু পদ্য লিখলেই কবি হওয়া যায় না, কবিকে অনুকরণ করতে হয় কর্মের। সেই সঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এ্যারিস্টটলের মতে অনুকরণের উপজীব্য মানুষ হবে হয় আমাদের সমান সমান, না হয় নিকৃষ্টতর, নয়ত উচ্চতর। ট্র্যাজেডি আমাদের তুলনায় মহত্তর মানুষের অনুকরণ। হোমারের নায়ক সাধারণ মানুষ নন। অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ কবি যিনি তিনি উচ্চতর বাস্তবের চিত্র আঁকেন, মানুষকে চিত্রিত করেন তার যেমন হওয়া উচিত ছিল তেমন করে। শ্রেষ্ঠ সাহিত্যে তাই জীবনের আদর্শায়িত রূপ দেখতে পাওয়া যায়। অতএব, কবি যিনি তিনি কোন অবস্থাতেই নিষ্প্রান দর্পন নন, তিনি একজন স্রষ্টা যাঁর ভেতর অনুপ্রেরণা আছে এবং আছে উচ্চতর জীবনের কল্পনা। এই পরিপ্রেক্ষতটি খেয়াল রাখলে অনুকরণতত্ত্বের রোমান্টিক সমালোচনার সবটাই যে গ্রহণযোগ্য নয় তা ধরা পড়ে।

অনুকরণের মত বিমোক্ষণ শব্দটিও এ্যারিস্টটলের আগেই প্রচলিত ছিল। এ্যারিস্টটলের কৃতিত্ব শব্দটিকে তিনি ট্র্যাজেডির শিল্পপ্রকৃতি বিশ্লেষণের কাজে নিযুক্ত করেছেন। বিমোক্ষণের ব্যাখ্যা নিয়ে তর্ক হয়েছে, কিন্তু ট্র্যাজেডিতে বিমোক্ষণের ভূমিকা অস্বীকৃত হয়নি। বিমোক্ষণ কথাটি ব্যবহার কালে এ্যারিস্টটল নিশ্চয়ই গ্রীক ট্র্যাজেডির অভিনয়ানুষ্ঠানের কথা স্মরণ করেছিলেন। গ্রীক ট্র্যাজেডিতে নায়ক একজন অতিবড় চরিত্র: শুধু মনের দিক দিয়েই নয়, শরীরের দিক দিয়েও। নায়ক মঞ্চে নামতেন পায়ের নীচে ভারী সোলের উঁচু জুতা পড়ে মুখে লম্বা মুখোস এঁটে, গায়ে জম-

কালো জোব্বা চড়িয়ে। হাজার হাজার মানুষ এক সঙ্গে দেখতো তাকে, সন্ত্রস্ত হয়ে উঠত ভয়ে, সিক্ত হয়ে উঠত করুণায়। ডায়োনেস্যুসের বার্ষিক ধর্মীয় অনুষ্ঠান ছিল সম্প্রদায়ের ক্রটিস্খালনের অনুষ্ঠান, ভিড়ের মধ্যে একেকটি মানুষের মনে আলাদা আলাদা করে বিমোক্ষণ ঘটিয়ে ট্র্যাজেডি এই শুদ্ধিকরণে সহায়ক হয়। গ্রীক ট্র্যাজেডির বাইরেও ঃ মহাকাব্যে বিমোক্ষণ থাকে, উপন্যাসেও।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে, ট্র্যাজেডিতে গ্রীক-প্রতিভার বৈশিষ্ট্য যতটা প্রকাশ পেয়েছে অন্য কোন সাহিত্যিক রূপকল্পে ততটা পায়নি। পৃথিবীর চারজন শ্রেষ্ঠ ট্র্যাজেডি লেখকের ভেতর তিনজনই গ্রীক, চতুর্থ জন ইংরেজ। দাশুরায়ের পাঁচালির প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "এই পাঁচালিতে কেবল দাশরথির একলার মনের কথা পাওয়া যায় না; ইহাতে একটি বিশেষ কালের বিশেষ মণ্ডলীর অনুরাগ-বিরাগ শ্রদ্ধা-বিশ্বাস রুচি আপনি প্রকাশ পাইয়াছে।" এ কথা গ্রীক ট্র্যাজেডি সম্পর্কেও সত্য।

গ্রীক ট্র্যাজেডি রচনা গ্রীক প্রতিভার পক্ষেই শুধু সম্ভবপর ছিল। এই ট্র্যাজেডি সৃষ্টির মূলে আছে একটি বিশেষ জীবনসৃষ্টি, সে-সৃষ্টি পরলোকের চাইতে ইহলোকের উপরই বেশী করে নিবদ্ধ। ইহলোকের দুর্ভোগ পূর্বজন্মের শাস্তি নয়, এই দুর্ভোগে কোন পরলৌকিক মোক্ষ নিহিত নেই; দুর্ভোগ ভাগ্যের বিধান, সে-ভাগ্য রসস্যময় ও অপরিজ্ঞাত। ভাগ্য অমোঘ হতে পারে, কিন্তু তার বিরুদ্ধে সংগ্রামেই বীরত্ব। ট্র্যাজেডি এই বীরত্বেরই অনুকরণ, পরাজয়ের মুখে অপরাজেয় মনোভাবের শিল্পগত প্রকাশ। তদুপরি, এই দুর্ভোগের দায়িত্ব সমাজের নয়, দায়িত্ব ব্যক্তির, কেননা ব্যক্তির দুর্বলতার পথেই দুর্ভোগের আগমন।

এই জীবনসৃষ্টি গ্রীস দেশের নিজস্ব। প্রাচ্য দেশের পক্ষে জীবনকে এ-ভাবে বিচার বা গ্রহণ করা সহজ নয়, তাই বাংলা রচনায় ট্র্যাজেডির স্থান সীমাবদ্ধ ও বিদেশের অনুকরণনির্ভর। মিশরের সভ্যতা গ্রীসের সভ্যতার চেয়ে প্রাচীনতর। তবু মিসর যে ট্র্যাজেডি লেখেনি তার কারণ প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতায় জীবনের তুলনায় অধিকতর মর্যাদা ছিল মৃত্যুর। পিরামিডে-মমিতে সেই মর্যাদারই প্রকাশ। অন্য-দিকে গ্রীক সংস্কৃতি একান্তই জীবননির্ভর ঃ গ্রীক স্থাপত্য, দর্শন, খেলাধূলা, উপকথা যেমন গ্রীক ট্র্যাজেডিও তেমনি, জীবনের জয়গান বৈ নয়। ইসকাইলাস, সফোক্লিস

ও ইউরিপিডিসের পরে এই ত্রয়ীর সঙ্গে তুলনাযোগ্য ট্র্যাজেডি লেখকের জন্ম আর একবারই হয়েছিল—এলিজাবেথীয় ইংলণ্ডে! সে-যুগটা ইংলণ্ডের ইতিহাসে সর্বপেক্ষা গৌরবের যুগ। ইংলণ্ড তখন প্রাচীন গ্রীস ও রোমকে আবিষ্কার করেছে, নাবিকদের পাঠিয়েছে বিশ্বপ্রদক্ষিণে। স্পেনের প্রবল পরাক্রান্ত নৌবাহিনীকে পরাস্ত করেছে। মানবস্বীকৃতির সেই রেনেসান্স পরবর্তী আবহের বাসিন্দা শেক্সপীয়র মনের দিক থেকে গ্রীসের দূরবর্তী ছিলেন না। মহাকাব্য আরো অনেক দেশে রচিত হয়েছে, কিন্তু সার্থক ট্র্যাজেডি গ্রীসের বাইরে ঐ একবারই।

ট্র্যাজেডিকে এ্যারিস্টটল শ্রেষ্ঠতম সাহিত্যিক রূপকল্প বলে গণ্য করেছেন। ট্র্যাজেডি মহাকব্যের চেয়ে মহত্তর; কেননা ট্র্যাজেডিতে মহাকাব্যের সমুদয় উপাদান তো আছেই তদুপরি,(১) ট্র্যাজেডির আবেদন যেমন লভ্য পঠনে, তেমনি দর্শনেও, এবং (২) ট্র্যাজেডির আয়তন সঙ্কীর্ণতর বলে এর আঙ্গিক সংগঠন সুসংহত ও সুবিন্যস্ত। প্লটকে যে তিনি চরিত্রের চেয়ে অধিক মূল্য দিয়েছেন তার কারণও ট্র্যাজেডির এই দুই বৈশিষ্ট্যের ভেতর অবলোকন করা যেতে পারে। ট্র্যাজেডিতে প্লটেরই গুরুত্ব বেশী, কেননা প্লট যদি যথাযথভাবে নির্মিত না হয় তা'হলে ট্র্যাজেডির অভিনয় দর্শনে যদি বা কিছুটা আনন্দ লাভ সম্ভব হয়, তথাপি পঠনে কোন তৃপ্তি পাওয়া যাবে না। প্লট গল্প নয়, গল্পের শিল্পসম্মত সংগঠন। সেই সংগঠন যদি দুর্বল হয় ট্র্যাজেডির কাঠামো যদি হয় অনির্দিষ্ট, নক্সা অস্পষ্ট, ঘটনার পারম্পর্য বিশৃঙ্খল, কাহিনীতে যদি না থাকে সংহতি ট্র্যাজেডি তা'হলে দাঁড়াবে কি করে? বিশেষতঃ, ট্র্যাজেডি যেহেতু আয়তনে সঙ্কীর্ণ তাই তার ঘটনানিচয়ের ভেতর একটা ঋজু ঐক্য এবং অনাবশ্যকের নির্মম বর্জন না থাকলেই নয়। ঐক্য মহাকাব্যেও প্রয়োজন: ট্রয়ের যুদ্ধ চলেছিল দশ বছর; কিন্তু হোমার তাঁর 'ইলিয়াডে'র জন্য এই দীর্ঘ মহাযুদ্ধের শেষপর্বের একটি খণ্ডাংশ মাত্র বেছে নিয়েছিলেন—সেটি এমন একটি খণ্ডাংশ যার ঘটনাগুলো একটি ঐক্যসূত্রে গ্রথিত। ট্র্যাজেডির তুলনায় মহাকাব্য অনেক বেশী সুবিস্তৃত, তাই ট্র্যাজেডির ঘটনাপরম্পরা হবে আরো বেশী গাঢ়-সংবদ্ধ। এ্যারিস্টটল ট্র্যাজেডির মঞ্চায়িত রূপের দিকে যত না নজর দিয়েছেন তার চেয়ে বেশী লক্ষ্য করেছেন এই রূপকল্পের বুদ্ধিগ্রাহ্য রূপকে। ট্র্যাজেডির ছয়টি উপাদানের মধ্যে মঞ্চসজ্জা হল নিকৃষ্টতম। কেননা দৃশ্য ও মঞ্চসজ্জার জন্য কৃতিত্ব যদি কারো প্রাপ্য হয় তো সে মঞ্চকুশলীদের, নাট্যকারের নয়। তা ছাড়া যে-নাট্যকার তাঁর সাফল্যের জন্য অভিনেতার দক্ষতা কি দৃশ্যসজ্জানির্মাতার কুশলতার উপর নির্ভরশীল তিনি করুণারই পাত্র।

চার্লস ল্যাম, একদা মন্তব্য করেছিলেন যে, শেক্সপীয়রের ট্র্যাজেডিগুলোর আদৌ মঞ্চায়ন হওয়া উচিৎ নয়। কেননা মঞ্চে একজন হ্যামলেট কি একজন ওথেলোকে টেনে আনার মানে চরিত্রটিকে স্থূল করে ফেলা। শেক্সপীয়রের তুলনা বিরহিত কবিতার এলাকা ডিঙ্গিয়ে বুদ্ধিজীবী বিষণ্ণ সেই তরুণ, হ্যামলেট, যদি একজন পেশাদার অভিনেতার শরীরে ভর করে দর্শকের চোখের সামনে হাজির হয় তাহলে কল্পনার মানুষটির সঙ্গে এই মঞ্চবিহারী চরিত্রটির পার্থক্য দেখে দর্শক হয়ত শিউরে উঠবেন, বুঝতে পারবেন অন্যসব মহৎ কবির মত শেক্সপীয়রকেও কেন আমাদের ঘরে বসে নিজের মত করে পড়া উচিত। দৃশ্যসজ্জাকে হেয় বিবেচনা করে এ্যারিস্টটল পৃথিবীর সকল দেশের সকল কালের মঞ্চের জন্য একটা অতি-প্রয়োজনীয় মূলনীতি রেখে গেছেন। নাটককে আমরা বলি দৃশ্যকাব্য; কিন্তু নাটকের মঞ্চায়নে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন দৃশ্য যেন কাব্যকে ছাপিয়ে না ওঠে, সাজসজ্জা যেন সাহিত্যকে অবগুণ্ঠিত না করে, নাটক দেখে ঘরে ফেরার পথে দর্শক যেন নাটকের কথাই মনে রাখেন, মঞ্চসজ্জার কথা নয়। মঞ্চায়নের বিষয়টি নিয়ে তিনি যে বিস্তারিত আলোচনা করেননি সেটা মঞ্চের পক্ষে দুর্ভাগ্যজনক। মূলকথা, নাটককে এ্যারিস্টটল সাহিত্য হিসাবে বিচার করার অভিলাষী। এবং নাট্যকার যেহেতু মঞ্চসজ্জার অবলম্বন পাবেন না তাই তাঁর একমাত্র সহায় হবে প্লট।

প্লটটিকে হতে হবে এমন যাতে মঞ্চায়ন বাদ দিয়ে শুধু পড়েই, বা কাহিনীটা শুনেই আতঙ্কিত ও করুণাসিক্ত হয়ে ওঠা সম্ভবপর হয়। এজন্যেই প্লটকে তিনি বলেছেন ট্র্যাজেডির প্রাণ। এক জায়গায় প্রায় অন এ্যারিস্টটলীয় উৎসাহের সঙ্গে ঘোষণা করেছেন, চরিত্র ব্যতিরেকেও ট্র্যাজেডি সম্ভবপর, কিন্তু প্লট ব্যতিরেকে একেবারেই নয়। কিন্তু ঐ একবারই; এই চরম মতের সমর্থনে আর কোন উক্তি নেই 'কাব্যতত্ত্বে'। তাই এমন হওয়া অসম্ভব নয় যে, এই অতিউৎসাহী ঘোষণাটি একটি প্রক্ষিপ্ত বাক্য মাত্র—এ্যারিস্টলের নিজস্ব উক্তি নয়। এই অনুমান যদি অসত্যও হয়, তবু এই বাক্যটিকে এ্যারিস্টটলের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বলে গণ্য করা অসঙ্গত।

প্লট সম্পর্কে উচ্চধারণা পোষণ হেতু এ্যারিস্টটলকে অনেক সমালোচনা সহ্য করতে হয়েছে। এ্যারিস্টটল গ্রীক ট্র্যাজেডির প্লটপ্রধান রূপকে সামনে রেখে তাঁর মতামত তৈরী করেছেন; কিন্তু তাই বলে এটাই একমাত্র যুক্তি নয় এ-বিষয়ে এ্যারিস্টটলের মতকে সমর্থন করার। অন্য যুক্তিও আছে। প্রথমতঃ, এ্যারিস্টটলীয় অর্থে চরিত্র

প্লটের অন্তর্গত ঃ চরিত্রের অবস্থান প্লট-কাঠামোর ভেতরে, এই কাঠামোর বাইরে চরিত্রের কোন পরিচয়ই নেই। ঘটনাপরম্পরার মধ্য দিয়েই প্লট অগ্রসর হয়, চরিত্র আত্মপ্রকাশ করে। প্লট হ'ল কর্মের অন্ধঅনুকরণ, কিন্তু কর্মের কর্তা কে ?—নায়ক। এই কর্তাটিকে ছাড়া কর্ম সম্ভবপর নয়। দ্বিতীয়তঃ, প্লেটোর গুরুত্ব কোন অবস্থাতেই অনস্বীকার্য নয়। এমনকি আধুনিক কালে, যখন প্রবণতা দেখা দিয়েছে চৈতন্যের প্রবাহকে অবারিত করার জন্য ঘটনা, সময় বা বক্তব্যের ধারাবাহিকতা ও সুশৃঙ্খলাকে লঙ্ঘন করে, কাহিনীর কাঠামো বিচুর্ণ করে দিয়ে চেতন-অবচেতন দূর-নিকটকে একত্র উপস্থিতকরণের, মহৎ নায়কেরা যখন প্রায় নির্বাসিত তখনো সুবিন্যস্ত প্লট পেলে পাঠক যতটা খুশি হয় তত বোধ হয় আর কিছুতেই নয়। জীবন তো বিশৃঙ্খলই, তার একটি ঘটনার সঙ্গে আরেকটি ঘটনার যোগাযোগ যে থাকবেই এমন নিশ্চয়তা নেই, আগের সঙ্গে পরের যে সঙ্গতি ঘটবেই এমন কোন কথা নেই ; ট্র্যাজেডির দায়িত্ব শৃঙ্খলা, যোগাযোগ ও সঙ্গতি আনয়ন করা। নির্বাচিত ঘটনাসমুহকে আদি, মধ্য অন্তের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে, একটি ঘটনার সঙ্গে আরেকটি ঘটনার ঐক্য সংস্থাপনের মাধ্যমে প্লট অত্যাবশ্যকীয় সেই কাঠামোটি সরবরাহ করে যে-টি না থাকলে গাঢ় সংঘবদ্ধতার অভাবে ট্র্যাজেডির মহত্তম আবেদন সৃষ্টি দূরে থাক, তার দেহটিই টিকবে না। প্লটের বিভিন্ন অংশের ভেতর সম্পর্কটা হবে এই রকম যাতে কোন অংশকেই বাদ দেওয়া যাবে না, বাদ দিলে সমস্ত প্লটটাই অন্য রকম চেহারা নেবে।

এ্যারিস্টটলের মতে ট্র্যাজেডির ভাষা হবে উন্নত অথচ সুবোধ্য, স্পষ্ট অথচ মার্জিত ; অর্থাৎ মধ্যপথবর্তী। এই নির্দেশনাতে বিজ্ঞতা আছে। ভাষা বিষয়ক আলোচনা অবশ্যিই 'কাব্যতত্ত্বের' একটি দুর্বলতা। রূপকল্পসৃষ্টির ব্যাখ্যাকালে নিজের অজ্ঞাতেই তিনি শিল্প সমালোচনায় বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি-প্রয়োগের সীমাবদ্ধতার বিষয়ে একটা সাক্ষ্য রেখে গেছেন। কবিতার রূপকে উপমানের সঙ্গে উপমিতের যে-সম্পর্ক সেটা যে যান্ত্রিক নয়, উপমান-উপমিতের সাদৃশ্যাবিষ্কার যে বুদ্ধির কাজ নয় এবং কবিতার ভাষায় যে খানিকটা থাকে অনির্বচনীয়, কিছুটা অনির্দিষ্ট, যার জন্য কবিতাকে কখনোই সম্পূর্ণতঃ বোঝা সম্ভব নয়, আর সম্ভব নয় বলেই একই কবিতা বার বার পাঠ করা সম্ভব, সম্ভব প্রতি পাঠে নতুন নতুন অর্থ ও আনন্দ লাভ—বৈজ্ঞানিক এ্যারিস্টটল সেই বুনিয়াদী কাব্যিক সত্যটিকে অস্বীকার করেছেন। না করলেই হয়ত ভালো ছিল। (শব্দালোচনার একটি অংশ—'কাব্যতত্ত্বের' ২০ নম্বর পরি-

চ্ছেদটি—যেখানে ব্যাকরণের অবতারণা করা হয়েছে সেটি এ্যারিস্টটলের নিজের লেখা কিনা তা নিয়ে ঘোরতর সন্দেহ আছে।) তবু, এই দুর্বল এলাকাতেও একটি মূল্যবান সত্যের সাক্ষাত মেলে। তিনি বলেছেন কবির শক্তির পরিচয় লাভ করা যায় তাঁর রূপক সৃষ্টিতে। এই মতের সত্যতা সর্বজনস্বীকৃত। রূপকের স্থলে একটি ব্যাপকতর শব্দ, চিত্রকল্প, ব্যবহার করে বলা হয়ে থাকে যে কবির কল্পনা কতটা গভীর, বিস্তৃত বা জীবন্ত তা জানতে হলে তাঁর চিত্রকল্পগুলো পরীক্ষা করে দেখ, যথার্থ সত্য খুঁজে পাবে।

তা'হলে দেখা যাচ্ছে এ্যারিস্টটল সর্বত্র অভ্রান্ত নন। কিন্তু কালের কথা স্মরণ করলে তিনি যে কোথাও ভ্রান্ত এ-কথা ভেবে দুঃখ করার কারণ থাকে না, বরং বিস্মিত হতে হয় এটা দেখে যে অনেক সময়েই তিনি অভ্রান্ত। সাহিত্যকে তিনি বলেছেন "নাম-না-জানা শিল্প"। সেই নাম-জানা শিল্পকলার ক্ষেত্রে তিনি আবিষ্কার করেছেন কার্যকরী প্রধান প্রধান শক্তিগুলোকে, প্রতিষ্ঠিত করেছেন তাদের কার্যধারার নিয়মাবলীকে। তৎসহ এক রূপকল্পের সঙ্গে অন্য রূপকল্পের, এক কলার সঙ্গে অন্য কলার, এক লেখকের সঙ্গে অন্য লেখকের সাদৃশ্য ও পার্থক্য নির্দেশিত করে তুলনামূলক সমালোচনাপদ্ধতির সূত্রপাত তিনিই করেন। ঐতিহাসিক সমালোচনার সুরুও এ্যারিস্টটল থেকেই। যেমন, 'ইলিয়াডের' একটি বর্ণনা, 'বর্শাগুলোকে তাদের কঁুদের উপর খাড়া করে রাখা হল'-র যে সমালোচনা হয়েছে তার জবাব তিনি দিয়েছেন এই বলে যে, তৎকালে ওটাই ছিল রীতি। তার মানে বিষয়ের নিষ্পত্তি হবে তৎকালীন মানদণ্ডে, বর্তমানের মানদণ্ডে নয়।

'কাব্যতত্ত্বে' গ্রীক সাহিত্য সম্পর্কে যে-সকল তথ্য ও মূল্যায়ন পাওয়া যায় তাদের তাৎপর্যও অনেক। কবিদের ভেতর শ্রেষ্ঠতম হলেন হোমার, নাট্যকারদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী ট্র্যাজিক ইউরিপিডিস, এ্যারিস্টোফিনিস যাঁকে নিয়ে ব্যঙ্গকৌতুক করেছেন। কিন্তু ইউরিপিডিসে ত্রুটি আছে অনেক রকম। নাটকে কোরাস ব্যবহারের বেলায় তাঁর উদাহরণ না মেনে মানা উচিত সফোক্লিসের দৃষ্টান্ত। অন্ততঃ একটি নাটকে ইউরিপিডিস মঞ্চকৌশলের উপর নির্ভর করেছেন; যেটা অনুচিত। তদুপরি ইউরিপিডিসের চরিত্রগুলো কোথাও কোথাও অসঙ্গতিপূর্ণ কোথাও বা অনাবশ্যক-রূপে কলঙ্কচিহ্নিত। গঠনের দিক থেকে আদর্শ ট্র্যাজেডি সফোক্লিসের 'ইডিপাসরেক্স'।

এ্যারিস্টটলের সমালোচনা বুদ্ধিভিত্তিক। পাঠকের কাছে তিনি সাহিত্যপাঠে তাঁর ব্যক্তিগত শিহরকে পৌঁছে দিতে চান না, তাঁর উদ্দেশ্য সাহিত্যের বুদ্ধিবাদী বিষয়মুখ বিশ্লেষণ। এই উদ্দেশ্যটি মনে রাখলে তাঁকে বুঝতে সুবিধা হয়। এবং তখন অনুধাবন করা যায় এই কাজে তাঁর যোগ্যতা কত বেশী, প্রস্তুতি কত বিস্তৃত, সাফল্য কতটা বিস্ময়কর। বিশেষকে পর্যবেক্ষণ করে তার ভেতর নির্বিশেষকে খুঁজে বার করা তথা এককের সঙ্গে সাধারণকে একত্র করার যে-প্রতিভা এ্যারিস্টটল অন্যত্র দেখিয়ে জ্ঞানীদের ভেতর জ্ঞানীর আসন পেয়েছেন সাহিত্য সমালোচনার ক্ষেত্রেও সেই একই সম্মান তাঁর প্রাপ্য।

৩

এ্যারিস্টটলীয় বিশ্লেষণানুযায়ী প্রত্যেক ট্র্যাজেডিতে ছয়টি অংশ থাকেঃ প্লট, চরিত্র, ভাবনা, বচন, দৃশ্যসজ্জা ও সঙ্গীত। প্লট, চরিত্র, ভাবনা, বচন ও দৃশ্যসজ্জা সব নাটকেরই বৈশিষ্ট্য; সঙ্গীত বিশেষভাবে গ্রীসের নাটকী কর্মের মধ্যে সঙ্গীত ব্যবহার গ্রীক ট্র্যাজেডির নিজস্ব রীতি। গ্রীস দেশে সঙ্গীতের শ্রুত রূপ কেমন ছিল তা আজ আর যথাযথ জানবার উপায় নেই; কিন্তু গ্রীক সংস্কৃতিতে সঙ্গীতের যে বিশেষ মর্যাদা ছিল সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তদানীন্তন রীতিতে ট্র্যাজেডিতে সঙ্গীত পরিবেশনার দায়িত্ব ছিল কোরাসের উপর। কোরাসকে এ্যারিস্টটল ট্র্যাজেডির আবশ্যকীয় অঙ্গ বলেই গণ্য করেছেন, এবং বলেছেন কোরাসকে একজন অভিনেতা হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। কোরাস একদল লোক নিয়ে গঠিত হত; নগরের সম্পন্ন ব্যক্তিদের উপর ভার পড়ত কোরাসের ব্যয় নির্বাহের। কোরাসের সঙ্গীত দু'রকমের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে পারত। এক, নাটকের মধ্যে বিরতির সৃষ্টি করা, ঘটনা যাতে এক ঘেয়ে হয়ে না ওঠে এবং দর্শকের কৌতুহল যাতে ক্লান্ত না হয়ে জাগরিত থাকে। দুই, ঘটনার উপর মন্তব্য করা, ভবিতব্যের পূর্বাভাষ ও পূর্বতনের ব্যাখ্যা দেওয়া। এই কাজে কোরাস কখনো সাজে নায়কের পরামর্শ দাতা, কখনো তার বিশ্বাসী বন্ধু। অনেক সময় কোরাস যেন মঞ্চের উপর নাটকের বাইরের জগতের প্রতিনিধি; যেন দর্শকের প্রতিভূ হয়ে সে দাঁড়িয়ে আছে, আর তার পাশে নায়ককে রেখে বোঝা যাচ্ছে নায়ক কতটা স্বাভাবিক বা সাধারণ, অস্বাভাবিক বা অসাধারণ।

সঙ্গীতের অন্যতর ভূমিকার উল্লেখ আছে এ্যারিস্টটলের "রাজনীতি" গ্রন্থের অষ্টম পরিচ্ছেদে ঃ

> প্রবল ভাবে চিত্তআন্দোলনকারী ভাবগুলো কিন্তু সকলের মধ্যেই আছে। তফাৎটা শুধু তীব্রতার; যেমন করুণা ও ভীতি, অথবা ধর্মীয় উত্তুঙ্গতা। অনেকে আছেন তাঁরা ধর্মীয় আবেগে উন্মত্ত হয়ে পড়েন, তখন তাঁদের আবেশমুক্ত করা হয় মরমী সঙ্গীত গেয়ে, যার ফলে সম্ভব হয় আত্মার নিরাময়তা ও বিমোক্ষণ। তেমনি যাঁদের প্রবণতা আছে করুণা ও ভীতি অথবা সাধারণ ভাবে যে-কোন অনুভবের দিকে উত্তেজিত অবস্থায় তাঁদের অনুভবের বিমোক্ষণ তথা আনন্দদায়ক উপশম সম্ভবপর।

এই প্রসঙ্গে তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন বিমোক্ষণ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করবেন কাব্যালোচনার সময়ে। কিন্তু সে প্রতিশ্রুতি রক্ষিত হয়েছে বলে জানা যায় না। বস্তুতঃ 'কাব্যতত্ত্বে' বিষয়টির কোন সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা নেই। তবু ধর্মীয় আবেগের উপসমনায় সঙ্গীত ব্যবহারের এই নজীর থেকে বিমোক্ষণ সম্বন্ধে এমন একটা ধারণা গড়ে তোলা যায় যে, শরীর থেকে করুণা ও ভীতিকে নির্গত করার কাজে করুণা ও ভীতির ব্যবহারই সর্বোত্তম পন্থা। অর্থাৎ বিষে বিষ ক্ষয়। উত্তেজিত হয়ে যে-শিশু কাঁদছে মা তাকে দোলনায় দুলিয়ে আরো উত্তেজিত করে তোলেন, এবং তাহাতেই সে শান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। গ্রীক চিকিৎশাস্ত্রে একটি ব্যবস্থাপত্র ছিল ঃ যে-কুকুর কামড়েছে তার চুল লাগালে তবেই আরোগ্য। ট্র্যাজেডিতেও ঐ প্রক্রিয়াই কার্যকরী; করুণা ও ভীতির বিমোক্ষণ সাধনের জন্য পাঠকের মনে করুণা ও ভীতিই সৃষ্টি করা হয়। তখন সেই উত্তেজনায় অনুভব দু'টি শরীর থেকে নির্গত হয়ে যায়, এবং অতঃপর চিত্তে ঝঞ্ঝাবসানের নির্মেঘ প্রশান্তি ফিরে আসে।

প্লটের আলোচনাকালে পরিস্থিতিবিপর্যয় ও প্রত্যভিজ্ঞানকে এ্যারিস্টল যে-গুরুত্ব দিয়েছেন আধুনিক পাঠকের কাছে তা অহেতুক মনে হতে পারে। কিন্তু পরিস্থিতি বিপর্যয় ও প্রত্যভিজ্ঞান গ্রীক ট্র্যাজেডির পক্ষে অত্যাবশ্যকীয়। নায়কের দুর্ভোগ সাধারণ দুর্ভোগ নয়। আকস্মিক দুর্ঘটনায় যদি তাঁর মৃত্যু হয় তাহলে সে-মৃত্যু ট্র্যাজিক হবে না। ট্র্যাজেডির দুর্ভোগে নায়কের নিজের দায়িত্ব আছে। আর আছে এক ধরণের নির্মম, নাটকীয় বক্রাঘাত। 'ইডিপাস রেক্স' নাটকে অধীর দূত ছুটে

এসেছে নায়ককে সুসংবাদ দেবে, কিন্তু যে-সংবাদ সে দিল তাতে উৎফুল্ল হওয়া দূরে থাক নায়ক নিক্ষিপ্ত হলেন সান্ত্বনাহীন দুর্ভোগের এক অতলান্ত গহ্বরে। কেননা খুশির খবর মনে করে দূত যা বলে গেল তাতে যবনিকা বিদীর্ণ হয়ে এই নৃশংশ সত্যটি জাজ্বল্যমান হয়ে উঠল যে, নায়ক ইডিপাস তাঁর পিতাকে হত্যা ও মাতাকে বিবাহ করেছেন, বিবাহে তাঁর সন্তান লাভ ঘটেছে। এই রকমের দুর্ভোগের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে নায়ক উপলব্ধি করেন যে, তিনি নিজেও দায়ী বিপর্যয়ের জন্য। রাজা ইডিপাস নিজেই তাঁর পিতাকে হত্যা করেছেন, বিবাহ করেছেন নিজের মাতাকে —এখন তাঁর সান্ত্বনা কোথায়? আত্মপরিচয় লাভ করাটাই হল প্রত্যভিজ্ঞান। যখন তিনি জানতে পারলেন তাঁর যথার্থ পরিচয় এখন বুঝলেন যে ভাগ্যের বক্রাঘাতে স্ত্রী ও সন্তানদের নিয়ে যে-জীবনযাপনকে সুখের মনে করেছিলেন সেই কল্পিত সুখের প্রতিটি পদক্ষেপে তিনি ক্রমান্বয়ে নিজের চরমতম দুর্ভোগের দিকে এগিয়ে গেছেন। সফল ট্র্যাজেডির পক্ষে তাই পরিস্থিতি বিপর্য্যয় ও প্রত্যভিজ্ঞান অত্যাবশ্যকীয়। এই দু'টি গুণসম্পন্ন প্লট এমনকি শুনলেও শিউরে উঠতে হয় ভয়ে, দ্রবীভূত হতে হয় করুনায়। পরিস্থিতি বিপর্যয়ের বৈশিষ্ট্য এই যে তাতে হিতে বিপরীত হয়, ভালো করতে যেয়ে মন্দ ফল ঘটে। আর প্রত্যভিজ্ঞানের উচিৎ ঘটনার ভেতর থেকে স্বাভাবিকভাবে ঘটা। যার উদাহরণ তিনি দিয়েছেন 'কাব্যতত্ত্বে'র ১১ ও ১৬ নম্বর পরিচ্ছেদে।

সমালোচকদের মতে ট্র্যাজেডির এই আলোচনা গ্রন্থের একটি ত্রুটি আছে। বিশিষ্ট রূপকল্প হিসেবে ট্রাজেডির উদ্ভব কি করে হল এ্যারিস্টটল তার বিশদ বিবরণ দেননি। ডিথিরাম্ব থেকে বিবর্তিত হয়ে ট্র্যাজেডির উৎপত্তি — 'কাব্যতত্ত্বে' এ-কথা উল্লেখ করা হয়েছে সত্য, কিন্তু ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সঙ্গে ট্র্যাজেডির যে-সম্পর্কটি ছিল তা তিনি নির্দিষ্ট করে দেখাননি। ট্র্যাজেডির জন্ম ডায়োনেসুসের বন্দনানুষ্ঠান। ডায়োনেসুস ছিলেন প্রকৃতির পল্লীদেবতা — ক্ষেতের ফসল, গাছের ফল ও ফলের রস সব তাঁরই অবদান। বছরে দু'বার তাঁর বন্দনা গাওয়া হত — শীতে ও বসন্তে। শীতের অনুষ্ঠানে পুরুষাঙ্গের প্রতিমূর্তি সঙ্গে নিয়ে একদল 'কোমাস' বা ফূর্তিকারী দেবতার উদ্দেশ্যে গান করত: পুরুষাঙ্গের এই বন্দনাগীতি-ই কমেডির উৎস। এ্যারিস্টটলের এটাই মত। বসন্তে হত নৃত্য গানের উৎসব। এই উৎসবের প্রয়োজনেই নৃত্যগীতের একটা রূপকল্পের উদ্ভব হয়, এই রূপকল্পকে বলা হত ডিথিরাম্ব। ট্র্যাজেডি ডিথিরাম্বেরই একটি বিবর্তিত রূপ ট্র্যাজেডির আক্ষরিক অর্থ 'অজ-সঙ্গীত'। প্রকৃতির

দেবতা ডায়োনেসুসের সঙ্গে নানান ধরণের সহচর থাকত; তাদের একজন হল 'স্যাটির'। 'স্যাটির' না মানুষ, না ছাগলঃ অর্ধেকটা তার মানুষের চেহারা, বাকিটা ছাগলের। ডিথিরাম্বের নৃত্যগীতে অভিনেতাদের কেউ কেউ নামত 'স্যাটির'দের সাজসজ্জা নিয়ে। পরে যখন ডিথিরাম্বের সঙ্গে সংলাপ যুক্ত হল, এল প্লট, চরিত্র ও ভাবনা তখন নৃত্যগীতের অংশটা স্বভাবতঃই আগের গুরুত্ব বজায় রাখতে পারল না। বলতে গেলে একটা নতুন রূপকল্পেরই সৃষ্ট হল। এই রূপকল্প ট্র্যাজেডি। একদা যে এর সঙ্গে স্যাটিরদের একটা সম্পর্ক ছিল তার স্মরকচিহ্ন জাগরুক হয়ে রইল ট্র্যাজেডির ট্র্যাজেডি অর্থাৎ 'অজসঙ্গীত' নামকরণে; আর ডিথিরাম্বের সঙ্গে তার যে অন্তরঙ্গতা ও সখ্য ছিল তার পরিচয় টিকে থাকল কোরাসে। কিন্তু এই অসম্পূর্ণতার চেয়েও বড় দুঃখের কারণ এই যে, সম্পর্ক "কাব্যতত্ত্বে"র সবটা ভাবী-কালের হাতে আসেনি।